বারান্দার জানালা

মহাশ্বেতা

বারান্দার জানালা

মহাশ্বেতা

বারান্দার জানালা

মহাশ্বেতা

eBook Created By: মলয় দেবনাথ

Need More Books!
Gooo...

www.shishukishor.org
www.amarboi.com
www.banglaepub.com
www.boierhut.com/group

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯
প্রস্থস্বত্ব: মহাশ্বেতা
বন্ধু প্রকাশনের পক্ষে ই -১১ নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট
হাউসিং কো অপারেটিভ সোসাইটি, কলকাতা - ৯৪ থেকে প্রকাশিত।
মূল্য: ৩৫ টাকা
হাতেখড়ি সিরিজ: প্রকাশনা ১

উৎসর্গ
দাদুভাই, ঠাম্মা ও দিম্মাকে

সূচিপত্র

লজেন্স
লাকি
আলোকিত
দুই বন্ধু
ঠাম্মা
সোনার জন্য চিঠি
বাবাই দাদার উপহার
ছাত্রী
মুখার্জি অদৃশ্য
বারান্দার জানালা

লজেন্স

স্কুল থেকে ফিরছিলাম আমাদের বিখ্যাত কাকুর বিখ্যাত অটোয় চেপে। অটোটা দেখতে শুনতে তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনদিন পর পর সেই যে ধ্যানে বসবে, তার ধ্যান ভেঙে উঠতে অনেকদিন লেগে যাবে। সেই কদিন কাকু আসবে রিকশা নিয়ে। সেই রিকশায় দুজনের জায়গায় ছ'জন বসে কোনরকমে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হবে স্কুল।

সেদিন অবশ্য অটো বাবাজির মন মেজাজ ভালোই ছিল। টানা চারদিন খারাপ না হয়ে কাজ করছে। অতএব আমরাও বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছি। অটোর জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। কি সুখ ! দুজনকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমার পালা। চেনা রাস্তা শুরু হয়ে গেছিল। সামনেই মোড়ের সেই লজেন্সের দোকান, তার বাঁ দিকেই গলি, গলিতে ডান দিকের সারির চতুর্থ বাড়িটাই আমাদের। একতলার বারান্দায় ঠাম্মা রোজ চেয়ারে বসে থাকে এই সময়টাতে।

লজেন্সের দোকানের সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম। সামনে থরে থরে কৌটো, বয়াম। আর সেই সব কৌটো বয়াম ভর্তি না-জানি কতরকমের লজেন্স, চকোলেট, ললিপপ আরও কত কি! যেন এক গুপ্তধনের ভাণ্ডার। এই সব দোকান লুট না করে চোরেরা যে কেন গয়নার দোকানে যায়, বুঝি না।

অটোটা তখন ফুটপাথ ঘেঁষে চলছিল। চোখের সামনে থরে থরে সাজানো কতরকমের লজেন্সের মধ্যে তখনই প্রথম চোখে পড়ল জিনিসটা। প্রথম সারিতেই কৌটোটা সাজিয়ে রেখেছিল দোকানদার। বেশ বড় কৌটো, তার ভেতরে ভর্তি গোলাপি গোলাপি কি যেন। দূর থেকে খুব ভাল বোঝা গেল না। খুব কিনতে ইচ্ছে হচ্ছিল জিনিসগুলো। অমন সুন্দর গোলাপি রঙের লজেন্স আমি আগে দেখিনি কখনও । টিভির সমস্ত বিজ্ঞাপন মনে করবার চেষ্টা করলাম। ওইরকম কোন লজেন্স বা চকোলেটের বিজ্ঞাপন ছিল কিনা। না, সেরকম কিছু মনে পড়লও না।

বাড়ি এসে গিয়েছিল ততক্ষণে। যথারীতি ঠাম্মা বসে ছিল বারান্দায়, হাতে পাঁজি। সারাদিন কীসের যে এত দিনক্ষণ ঠিক করে তা ভগবানই জানে। আমাকে দেখতেই পাঁজি বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। এবার খেতে বসা হবে।

খাওয়াদাওয়ার পরে প্রথমে ঠাম্মা জেদ করাতে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম অল্প কিছুক্ষণ ঠাম্মার কাছে। তারপর ঠিক যখন ঠাম্মার নাকটা ফুরফুর করে ডাকতে লাগল আর পেটটা তার তালে তালে উঠতে-নামতে লাগল তখন বুঝলাম সময় হয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সেদিন সারাটা দুপুর টিভি দেখেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু টিভি দেখে বিশেষ কোন ফল হল না। ওইরকম গোলাপি লজেন্সের কোন বিজ্ঞাপনই নেই।

বিকেলবেলায় যখন টিভি দেখে দেখে চোখ টনটন করছে তখন মনে হল দোকানে গিয়ে খোঁজ করলেই তো হয়। আমার মোড়ের দোকান অবধি একা একা যাওয়ার পারমিশান আছে। অতএব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলাম। আমি ওই দোকানের রোজকার খদ্দের । দোকানদার আমায় খুব ভালো করেই চেনে। রোজ ঠাম্মার দেওয়া এক টাকা নিয়ে গিয়ে লজেন্স কিনি আমি। সেদিন আমাকে দেখে আমার পছন্দ মতন চিউইংগামের কৌটো খুলতে শুরু করে দিয়েছিল দোকানদার। আমি দোকানের কাছে যেতে যেতে বেরও করে ফেলেছিল চিউইংগাম। জিজ্ঞেস করল, "এটাই নেবে তো?"

আমি খুব ভাল করেই জানতাম যে একটাকায় ওই সুন্দর দেখতে গোলাপি লজেন্সটা পাওয়া যাবে না অতএব এক টাকাটা বাড়িয়ে ধরলাম দোকানদারের সামনে। সে আমার হাত থেকে কয়েনটা নিয়ে ধরিয়ে দিল চিউইং গামটা। আমি সেটার খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরতে পুরতে সরে গেলাম একটু ডান দিকে। আমার সামনেই সেই গোলাপি লজেন্সে ভরা কাচের কৌটো। কাছ থেকে দেখতে আরও ভালো লাগছিল সেগুলোকে। আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম গোলাপি জিনিসগুলো আসলে লজেন্স নয়, তার থেকে বড় কিছু। গোলাপি রঙটা আসলে সেগুলোর বাইরের কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল ঠাম্মার কথা। ঠিক সময়ে না ফিরলে দুপুরে টিভি দেখার নালিশ করবে ঠিক মার কাছে, অতএব গোলাপি লজেন্সের চিন্তা সব দোকানে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরতে হল আমায়।

পরদিন কিন্তু আমি ভালোভাবেই তৈরি হয়েছিলাম। স্কুল থেকে ফিরেই হাত-পা-মুখ ধুলাম, পরিস্কার করে খেলাম, দুপুরে ঘুমোলাম আর বিকেলে একটার বদলে দুখানা কলা খেলাম। দেখি এত সব করাতে ঠাম্মার মেজাজ বেশ ভাল। শুরু করলাম সাধাসাধি , যাতে আমার আজকের রেশন একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে এক টাকার বদলে একটু বেশি করে টাকা-পয়সা দেওয়া হয় আমায়। ঠাম্মা এমনিতেই বেশ নরম ছিল আজ আমার ভাল ব্যবহারে খুশি, তাই বেশি সাধাসাধি করতে হল না আমাকে। ঠাম্মা তাঁর মানিব্যাগ থেকে বের করে দিল তিনটে এক টাকার কয়েন, মানে, আজ আমি এক টাকার বদলে পেলাম তিন টাকা। ভীষণ আনন্দ হল আমার। এক টাকায় পাওয়া না যাক সেই সুন্দর দেখতে গোলাপি লজেন্স, তিন টাকায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। বেশ একটু থমথমে পরিবেশ। আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি তখনি বৃষ্টির আগের সেই ভেজা ভেজা হাওয়া বইতে লাগল চারিদিকে। বেশ বুঝতে পারলাম আজ বৃষ্টি হবে। আমি দৌড় লাগালাম দোকানের দিকে। ফিরতে ফিরতে যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তাহলে ঠাম্মা খুব একটা খুশি যে হবে না তা আমি ভালো করেই জানতাম। দৌড়তে লাগলাম জোরে জোরে। মোড়ের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে হাঁপিয়ে উঠলাম আমি। সামনেই লজেসের দোকান। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা কিনছে। আমি আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম।

বুক ঢিপ ঢিপ করছিল আমার। সেটা জোরে দৌড়নোর জন্য, না লজেসের চিন্তায়, সেটা বুঝলাম না। মনে হতে লাগল, লজেন্সটার দাম আসলে কত? যদি লজেন্সটার দাম তিন টাকার বেশি হয় তাহলে কী করব? দোকানদার যদি আমায় নিয়ে হাসে?

দোকানের কাছে যেতেই বুক ঢিপঢিপানিটা অনেক বেড়ে গেল। গোলাপি লজেন্সের কৌটোটা দেখা যাচ্ছিল। সত্যিই কি সুন্দর রঙটা , খুব খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ভগবানের কাছে মনে মনে অনেকবার বললাম, হে ভগবান লজেন্সটার দাম যেন তিন টাকাই হয়। তিন টাকার বেশি যেন না হয়। আমি যেন লজেন্সটা কিনতে পারি। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে এগোতে লাগলাম দোকানের দিকে। গোলাপি লজেন্সের কৌটোটা আরও স্পষ্ট হচ্ছিল। লজেন্সগুলোকে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পারছিলাম আমি। আর বুক ঢিপঢিপানিটা বেড়েই চলেছিল। ভগবানের কাছে আরও বেশি বেশি প্রার্থনা করছিলাম, হে ভগবান লজেন্সটা যেন তিন টাকা দিয়েই কিনতে পারি।

দোকানদার আমাকে দেখে রোজকার মত হাসি হাসি মুখ করে চিউইং গামের কোটো খুলতে শুরু করেছিল। কাছে যেতে আবার আগের দিনের মতন জিজ্ঞেস করলো, ‘কি, এটাই নেবে তো?’

আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, ‘না, আজ আমায় ওইটা দাও।’ বলে আঙুল দিয়ে তাক করলাম ওই গোলাপী লজেসের কৌটোটার দিকে।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল। বড় বড় দুয়েকটা ফোঁটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। দোকানদার একবার আমায় আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, ‘ওইটা খাবে? কিন্তু ওটার দাম যে দশ টাকা। আছে তোমার কাছে?’ হঠাৎ করে বুক ঢিপঢিপানিটা কমে গেল। হতাশা ছেয়ে গেল আমার মনে। দ-শ-টা-কা! সে তো বাবা-মা আমায় কখনও ধরতেই দেয় না। দশ টাকা দাম লজেন্সটার! তাকিয়ে দেখলাম ফের কৌটোটার দিকে। হঠাৎ করে যেন কৌটোটা খুব উঁচু বলে মনে হল। খুব দুঃখ হচ্ছিল।

সেদিন বৃষ্টি মাথায় কোনরকমে তিনটে চিউইং গাম হাতের মুঠোয় করে দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। একদমই যে কাঁদিনি, সেটা বলব না। একদম ভিজে গেছিলাম বৃষ্টিতে। সেদিন রাতে বাবা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরল। হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, “দেখ তো এটা কী? আমার এক বন্ধু দিল তোকে দেয়ার জন্য। আমি তো প্যাকেট খুলেই অবাক। গোলাপি গোলাপি ওটা কি? সেই লজেন্সটা না? ভীষণ আনন্দ হল। শেষ পর্যন্ত লজেন্সটা আমি পেয়েই গেলাম।

লজেন্সগুলো খেতে মোটেই ভালো লাগেনি আমার। অতিরিক্ত মিষ্টি, তাছাড়া খোলসের ভেতরের রঙটাও মোটেই তেমন কিছু সুন্দর নয়। আমার বেশ হতাশই লাগল, মনে হল, না খেলেই ভালো হত, মুখের স্বাদটাও খারাপ হয়ে গেল।

লজেন্সগুলো তারপরে বেশ কয়েকদিন বলতে গেলে পড়েই ছিল। শেষ পর্যন্ত মা সেগুলো আমাদের কাজের মাসিকে তার বাচ্চাদের দেয়ার জন্য দিয়ে দিল।

মোড়ের দোকানের দোকানদার বেশ আশায় আশায় ছিল যে আমি ওই লজেন্সটা কিনতে আসব। পরের দিন আমায় দোকানের দিকে আসতে দেখে বেশ হাসি হাসি মুখেই খুলতে লাগল গোলাপি লজেন্সের কোটোটা। আমি গিয়ে তার দিকে এক টাকার কয়েনটা বাড়িয়ে ধরে বললাম, চিউইং গাম দাও না, একটা। দোকানদারের হাসিটা কেমন যেন মিলিয়ে গেল। সে গোলাপি লজেন্সের কোটো বন্ধ করে চিউইং গামের কৌটোটা খুলতে লাগল।

লাকি

পরীক্ষা শেষ। এক সপ্তাহ ছুটির পর আজই স্কুল খুলেছে। দিদিমনির হাতে এক বান্ডিল রুলটানা কাগজ দেখলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে। তারপর যদি দিদিমনি বলে ওগুলো অন্য ক্লাসের পেপার তাহলে হতাশ লাগে। সেকেন্ড পিরিয়ডে বিজ্ঞানের পেপার বেরোনর পর ক্লাসে প্রায় চোখের জলের বন্যা বয়ে গেল। নিষ্ঠুর দিদিমনি। কত মেয়ের চোখের জল বইয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। আমি সকালবেলা যতটুকু সাহস সঞ্চয় করে স্কুলে এসেছিলাম সবই চলে গেল। ফোর্থ পিরিয়ডে এলেন বাংলা দিদিমনি। হাতে পেপারের বান্ডিল দেখেই ইষ্টনাম জপ শুরু হয়ে গেল। সকালবেলাতেই কেউ একজন গুজব ছড়িয়েছিল যে বাংলায় আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে বেশি নম্বর উঠেছে ৮১।

পেপার দেওয়া শুরু হল দরজার কাছে ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে। কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা একটা নম্বর যেন জাদু জানে। মুহূর্তে কাঁদিয়ে দিতে পারে।

পেপার হাতে পেয়ে দুরু দুরু বক্ষে নম্বরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলাম। না ফেল করিনি। তবে খুব একটা খুশিও হলাম না। পেপার হাতে পাওয়ার পর মনে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার একটা খুব ক্ষীণ আশা জেগেছিল। পেলে কি ভালই না হত। প্রথমত ক্লাসের তরফ থেকে হাততালি তারপর বাড়ি গিয়ে ঠাম্মার কাছ থেকে কিছু পয়সা হাতানো যেত। বাবা মার স্পেশাল খাতিরের কথা আর না-ই বললাম। তবে নাহ্, সেসব আর এ যাত্রা হল না।

ক্লাসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চোখ পড়ল ফার্স্ট বেঞ্চে । ওখানে বসে অনিন্দিতা সেনগুপ্ত। ক্লাসের সবচেয়ে ভালো মেয়ে। ক্লাস ওয়ান থেকে নাকি ফার্স্ট হয়ে আসছে। একেই বলে ভাগ্য। ওকে পেপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। ঠাকুরঘরে টানা এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে প্রার্থনা করতে হয় না। রেজাল্টের আগের দিন ঘুম নিয়ে ভাবতে হয় না। পরীক্ষার ঠিক কয়েক মূহূর্ত আগে ওর পেট গোলায় না। উফ কি মজা ওর।

ক্লাসে দিদিমনির টেবিলের সামনে ইতিমধ্যে একটা লম্বা লাইন তৈরি হয়ে গেছিল। এক-আধ নম্বর বাড়ানোর জন্য পাঁচ মাইল লম্বা লাইনে দাঁড়ানো এদের কাছে ছেলেখেলা। আরও কত কি শোনা যায়! একবার নাকি বি সেকশনের নীপা কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে গেছিল অংক পরীক্ষায় এক নম্বর বাড়ানোর জন্য।

দুয়েকজনের পেপার দেখার পর দিদিমনি বিরক্ত হয়ে সবাইকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এরপর যে বক্তৃতা শুরু হবে তা জানত সবাই। এবারও তার ব্যাতিক্রম হল না। দিদিমনি বলা শুরু করলেন - ‘এবারের খাতা দেখে আমার তিন রাত ঘুম হয়নি। কি জঘন্য সব উত্তর লিখেছ তোমরা। আর হাতের লেখা কত বাজে হতে পারে তা তোমাদের খাতা দেখলে বোঝা যায়। তোমাদের সবচেয়ে বেশি নম্বর কমেছে রচনাতে। একটি ভ্রমণের বিবরণী- এমন একটা সোজা বিষয়

পেয়েও তোমরা কি করে এত বাজে পেতে পারো ? এই ক্লাসে কি কেউ রচনাতে পুরো নম্বর পেয়েছে?'

প্রশ্ন করার পর গোটা ক্লাসের মধ্যে একটাই হাত উঠল। যথারীতি এবারেও সেই অনিন্দিতা।

ক্লাসের সত্তর জোড়া চোখ একযোগে অনিন্দিতার দিকে তাকাল। ওকে দেখে দিদিমনিও নরম হলেন। মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে ফেলে বললেন - ''আহ ! অনিন্দিতা। আমি জানতাম। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছাড়া আর কে এত সুন্দর রচনা লিখবে।এই বলে আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তোমাদের সবার ওকে দেখে শেখা উচিৎ।'' তারপর অনিন্দিতাকে ডেকে বললেন, ''এসো অনিন্দিতা, পড়ে শোনাও তোমার রচনাটা এদের।'' চোখে ভারি চশমা পড়া ছোট-খাট মেয়েটি হাতে পরীক্ষার খাতা নিয়ে রচনা পড়তে লাগল। বেনারস বেড়াবার গল্প। সত্যিই কি সুন্দর। যেন বেনারস শহরটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমার দু চোখের সামনে।

লেখার উপসংহারটা ছিল এই রকম-- 'ফিরে আসার আগের দিন আর কোথাও যাওয়া হল না। হোটেলের বারান্দা থেকে বেনারসের সরু গলিতে লোক-জনের যাতায়াত দেখছিলাম। ভারত যেন এখানে আর বদলায়নি। সেই পুরোনটিই থেকে গেছে। হিন্দু ধর্ম যেন এখানকার প্রত্যেক ধূলি-কণা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। সন্ধে বেলা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরলে মনে একটা অদ্ভুত ভাব আসে যা অন্য কোথাও গিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়।'

অনিন্দিতার রচনা যে কখন শেষ হল বুঝতে পারলাম না। লেখার ঘোর কাটার পর গোটা ক্লাস হাততালিতে ফেটে পড়ল। এমনকি গোমড়ামুখো দিদিমনিও হাততালি দিলেন। হল্লা কমার পর দিদিমনি অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন- 'বেনারসে কি পুজোর সময়ে গেছিলে? নিশ্চয় খুব মজা করেছ?''

এই প্রশ্নে যে অনিন্দিতার কী যে হল বোঝা গেল না। দেখতে পেলাম অনিন্দিতা চশমা খুলে চোখ মুছল। গোটা ক্লাস অবাক। দিদিমনিও অবাক। একটু পরে ধরা গলায় অনিন্দিতা বলে উঠল-'' আমাকে বাবা মা কোথাও নিয়ে যায়নি। আমি আজ পর্যন্ত কোথাও বেড়াতে যাইনি। এই বলে অনিন্দিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমরা স্তব্ধ। আমাদের সামনে কেঁদে যাচ্ছে আমাদের মতে ক্লাসের সবচেয়ে লাকি মেয়ে- অনিন্দিতা সেনগুপ্ত।

আলোকিত

সকাল থেকেই দৌড়োদৌড়ি শুরু। আজ না দীপাবলি! তুলি, দীপ, শ্রীজ, আবির, তিন্নি, তপু, ওরা সবাই খুব ব্যস্ত। এবার দীপাবলি পড়েছে পয়লা নভেম্বরে। হাল্কা শীত শীত ভাব হাওয়ায়। সকালে উঠেই সবার প্রথম কাজ হল ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে অক্টোবর থেকে নভেম্বরে নিয়ে আসা। পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়িতেই এই একই দৃশ্য।

দশটা বাজতে বাজতেই ছয় বন্ধু জড়ো হল রাস্তায়। বাজি কিনতে যাওয়া হবে এবার। বাজির বাজার ওদের পাড়া থেকে বেশি দূর নয়। মিনিট পনেরোর রাস্তা। এইটুকু রাস্তা, তার ওপর যাচ্ছে ছ'জন, কিন্তু তবুও বড়রা কিছুতেই কিছু শুনবে না। বড় একজন কাউকে ওদের সঙ্গে পাঠাবেই। তবে এবারে মন্দের ভালো, ওদের সঙ্গে যাচ্ছে তিন্নির দিদি তিতলি ।

আগের দিন রাতে পাড়ার সব বড়রা গটমট করে তুলিদের বাড়িতে মিটিং করতে গেল দীপাবলির ব্যাপারে। ওরা সবাই বেশ ভয়ে ভয়েই ছিল। বড়রা মিটিংএ ঠিক করবে পরদিন কে ওদের সঙ্গে যাবে বাজির বাজারে। ভয় এই কারণে যে যদি সকলে মিলে আবিরের বদরাগী কাকা কিম্বা দীপের সেই ডাক্তার মাসি বা ওই ধরণের কাউকে দায়িত্বটা দেয়।

আবিরের বদরাগী কাকার অল্পতেই রাগ উঠে যায়। আর রেগে গেলে সে হাতের কাছে যা পায় তা ভাঙতে শুরু করে। এহেন লোককে নিয়ে বেরোনো মানে বিশাল এক ঝুঁকি নেওয়া। বাজির বাজারে গিয়ে যদি রেগে যায়, তাহলে তো বুঝতেই পারছ ! দীপের ডাক্তার মাসির কথাই ধর। তিনি সব জায়গায় জীবাণু দেখেন। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে জিনিসপত্রতেও তিনি দেখেন ব্যাক্টেরিয়া। আর অসুখ ? তাঁর মতে আমাদের সকলের সব শক্ত শক্ত রোগ, যাদের নামও আমরা কোনদিন শুনিনি। এই রকম মানুষ যদি বাজির বাজারে যায় তাহলে নির্ঘাৎ পরের দিন দোকানদার সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে বসবে। এইসব লোকজনদের নিয়েই ভয় করছিল সবাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ঠিক হল যে এবার তিতলিদি যাবে তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তিতলিদির নামে এই ধরনের কোন অপবাদ নেই। অতএব বাজি কেনবার যাত্রাটা জমবে ভাল।

রাতটা কাটাল সবাই কোন রকমে বিছানায় ছটফট করে। সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই সাতজনের মধ্যে ছজন হাজির হয়েছে রাস্তায়। এখন শুধু তপুর অপেক্ষা। সবসময়ের মত আজকেও ওর জন্য অপেক্ষা করতে হবে সবাই জানতো সেটা। কিন্তু দীপাবলি বলে কথা। সবাই বেশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল।

শ্রীজা রাস্তা ধরে হাঁটছিল। সঙ্গে আবির আর তুলি। ওরা সব চাইতে আগে এখানে এসেছে। যথারীতি ওদেরই সবচেয়ে বেশি অধৈর্য হওয়ার কথা। কিন্তু শ্রীজা ঠিক অধৈর্য হয়ে হাঁটছিল না। রাস্তার সবচেয়ে অন্ধকার কোনায় যে বাড়িটা

সেটার কাছে যেতে চাইছিল আসলে। এই দিকটাতে গাছপালা একটু বেশি আর ঘন। সূর্যের আলো না পড়াতে বেশ ঠান্ডা লাগছিল। তুলি বলল, 'চল শ্রীজা ফিরে যাই, ওদিকে তপু এসে গেছে বোধহয়।' উত্তরে শ্রীজা বলল, 'এই বাড়িটাতে একটা ছোট্ট ছেলে আছে, জানিস ? আমি ওকে দুয়েকবার দেখেছি। রাস্তায় বেরোয় না মোটে। একটা লম্বা লোকের সঙ্গে থাকে।ততক্ষণে ওরা বাড়িটার অনেক কাছে চলে এসেছিল। দিনের আলোতেও ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বাড়িটা। সামনের বাগানটায় আগাছা উঠছে। খুব এলোমেলো অবস্থা। এক এক জায়গায় বাড়িটার রঙ উঠে গেছে, কোন কোন জায়গায় ফাটল। আবির বলল, "ওই লম্বা লোকটা না, ভীষণ রাগী। একবার আমার দিকে এমন কটমট করে চেয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যে ও আমায় এক্ষুণি ধরে খেয়ে ফেলবে। বাচ্চাটা থাকে কি করে ওর সঙ্গে ? আচ্ছা ওকে একদিন ডাকলে হয় না ? না হয় খেলবে আমাদের সঙ্গে। শ্রীজা তুই ঠিক দেখেছিস তো?' এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে আবির হাঁপাতে লাগল। ওদিক থেকে তিতলিদির ডাক শোনা যাচ্ছিল। তিনজন মিলে উল্টোমুখে হাঁটা লাগাল।

বাজার সারতে সারতে সবার বেশ অনেকক্ষণ লাগল। এসেছিল খালি হাতে, ফিরল হাত ভর্তি ফুলঝুরি - রংমশাল - তুবড়ি-চরকি-রকেট বাজি নিয়ে। বাড়িতে সবাই তেতে পুড়ে পৌঁছলো যখন, তখন দেড়টা বাজে। মায়েরা সবাই বকাঝকা করল অল্প অল্প, কিন্তু তা গায়ে তো কিছুই নয়। শ্রীজা কিন্তু কিছুতেই মাথা থেকে ওই অন্ধকার বাড়িটা আর ওর বাসিন্দা সেই ছোট্ট ছেলেটাকে বার করতে পারল না। সারা দুপুর ওদের কথা ভাবল শ্রীজা। বাচ্চাটা কে? ওর নাম কী? ওই লম্বা লোকটা ওর কে হয়? ও বাড়ি থেকে বেরোয় না কেন? - এইরকম শত শত প্রশ্ন ঘুরতে লাগল ওর মাথার মধ্যে। শেষপর্যন্ত একটা প্ল্যানই সে ছকে ফেলল মনে মনে। এখন শুধু সন্ধের অপেক্ষা।

দুপুরটা কোনরকমে ছটফট করে কাটিয়ে দিল ওরা ছজন। অন্ধকার হতে না হতেই সাজানো শুরু হল প্রত্যেক বাড়িতে। তিন্নিদের ছাদে তিন্নি আর তিতলি মিলে মোমবাতি লাগাল, দীপের বাড়িতে রঙিন টুনিলাইট জ্বলে উঠল, তপুর বাড়িতে ওরা জ্বালাল মাটির প্রদীপ, শ্রীজাদের বাড়িতেও জ্বলল প্রদীপ, আবিরদের বারান্দায় জ্বলল মোমবাতি। দেখতে দেখতে আলোয় সেজে উঠল গোটা পাড়া। সব কী ঝকমকে ঝলমলে! আলো জ্বলল না শুধু পাড়ার সবচেয়ে অন্ধকার কোণে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটায়।

সেই অন্ধকার বাড়িটা থেকে বড়ো বড়ো চোখে ছেলেটা তাকিয়ে ছিল আলোকিত পাড়াটার দিকে। কি সুন্দরই না লাগছে আলোগুলো! কি সুন্দর বাজি ফাটছে দূরে! হালকা হালকা শব্দ ভেসে আসছিল বাজি ফাটার। সকলের বাড়ি সাজানো হয়েছে। মোমবাতি, প্রদীপ কিম্বা টুনি লাইট - কোন না কোন একটা রয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে। খালি ওদের বাড়ি ছাড়া। কে সাজাবে? কাকাকে খুব ভয় পায় যে ও। মুখ ফুটে কিছু বলতেও সাহস পায় না। তাই আজ পাড়ায় সব কটা

বাড়ি যখন সেজে উঠেছে আলোয়, তখন শুধু ওদের বাড়িটাই অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। কাকা অফিস থেকে এখনও ফেরেনি। বাড়িতে ও একা। ভয় লাগছিল ওর। বাইরেটা কি অন্ধকার !

ও ছোট্ট দুটো হাতে আঁকড়ে ধরেছিল একটা ছোট মোমবাতি। রান্নাঘরের এককোনে খুঁজে পেয়েছিল সেটা। আগুনও জ্বালিয়েছে মোমবাতিতে। আগুনের হলদেটে শিখাটা দপ দপ করে জ্বলছে। আগুনটা হাত দিয়ে ঘিরে শিখাটাকে বাঁচিয়ে রাখল ও। আস্তে আস্তে হেঁটে গেল ওদের বারান্দায়। সত্যি কি অন্ধকার এখানে! এখান থেকে ওই পাড়াটাকে একট স্বপ্নের রাজ্য মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার বারান্দার সবচেয়ে অন্ধকার কোনাটাতে লাগিয়ে ফেলল মোমবাতিটা। একটা হলদেটে আলো ছড়িয়ে গেল খানিকটা জায়গা জুড়ে। ওর মুখে ফুটে উঠল একটা অপূর্ব হাসি।

কিন্তু একি ! বারান্দাটা একটু বেশি আলোকিত মনে হচ্ছে যেন ? একটু না, বেশ আলোকিত। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ও। কে ওরা ? ফুলঝুরি হাতে একদল ছেলেমেয়ে। ওর সমবয়সীই হবে। ফুলঝুরির আলোতেই আলোকিত হয়ে উঠেছে অন্ধকার জায়গাটা। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ও সেই আলোকিত ছেলেমেয়েদের দিকে। সবার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা হাসছিল। কি সুন্দর হাসিটা! ওরা সকলেই কি সুন্দর! ঝলমল করছে যেন। এটা কি স্বপ্ন? স্বল্পই মনে হচ্ছে যেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেল যখন সেই মেয়েটা ওর হাতে নিজের ফুলঝুরিটা ধরিয়ে দিল। বিস্ময়ের সঙ্গে ও দেখল বস্তটাকে। সেই সুন্দর ছেলেমেয়েদের সকলের মুখে হাসি। ও-ও হেসে উঠল।

সেদিন রাতে তুলি, দীপ, শ্রীজা, আবির, তিন্নি, তপুর সঙ্গে আরেকজন বাজি ফাটিয়েছিল। ওদের সাতজনের হাসিতে ভরে উঠেছিল গোটা পাড়া আর আলোকিত জায়গাটা আরও আলোকিত লাগছিল যেন সেদিন।

দুই বন্ধু

আজ সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। ডিসেম্বর মাস তায় আবার বৃষ্টি। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। সন্ধেবেলার দিকে বৃষ্টিটা অবশেষে থামল। বাবা বাড়িতে নেই। দুদিনের জন্য কোথায় যেন গেছে। আকাশে চাঁদ উঠল সন্ধেবেলায়। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশ জুড়ে। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। কিছুক্ষণ পরিস্কার থাকবার পরই আবার বৃষ্টি শুরু হল। তবে এবার আর আগের মতো মুষলধারে নয়, টিপটিপে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকল না। নটা-সাড়ে নটার মধ্যে মেঘ কেটে গিয়ে আবার চাঁদ দেখা দিল। সারাদিন বাড়িতে থাকবার পর আমরা সকলেই বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করছিলাম। ভাই তো বৃষ্টি থামবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বেস্ট ফ্রেন্ড দারোয়ানজির সঙ্গে কত গল্পই না বাকি! মা আর আমি রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে হাঁটতে বেরোলাম। বৃষ্টির জল তখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। এদিক ওদিক, ফাটল বা নিচু জায়গায় এখনও জমে রয়েছে। আকাশে ঝুলে থাকা মরা চাঁদের ছায়া পড়ছে সেইসব জমে থাকা জলের ওপর। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে, তাতে গাছের পাতা নড়ার ঝিরঝির শব্দ - সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ।

মা আগে আগে হাঁটছিল। আমি ইচ্ছে করেই আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। কাছে গেটের পাশেই বসেছিল আমার ভাই আর দারোয়ানজি। একটার ওপর আরেকটা চেয়ার সাজিয়ে, একটা সিংহাসন ধরনের বানিয়ে, তার ওপর বসেছিল ভাই। ঠিক যেন কোন দেশের রাজা। তার ঠিক পায়ের পাশে, নিচু একটা টুলে বসে রয়েছে, তার বেস্ট ফ্রেন্ড, মানে আমাদের দারোয়ানজী (ঠিক যেন ভক্ত হনুমান)। রোজ রাতেই এই একইরকম দৃশ্য দেখা গিয়ে থাকে আমাদের বাড়িতে, দুই অসমবয়সী বন্ধু নিজেদের গল্প শোনায় একে অপরকে। ভাই বাড়িতে সবার চাইতে ভাল হিন্দি বলতে পারে অতএব হিন্দিভাষী দারোয়ানজির সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তবে ঠিক কী ধরনের গল্প যে হয় সেটাই সবচেয়ে বড় রহস্য। আজ এই সুযোগে ওদের কিছু কথোপকথন শুনতে পেলাম।

ভাই : দারোয়ানজি, আপনে ওহ্ তারা দেখা? (অর্থাৎ আপনি ওই তারাটি দেখেছেন?)

আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কালপুরুষের পায়ের কাছে লুব্ধক তারার দিকে তাক করল।

দারোয়ানজি : ওহ্ তারা বাবা? (ওই তারাটা বাবা?)

আসলে কিছুদিন আগে বাবা ছাদে নিয়ে গিয়ে তারা দেখাচ্ছিল সবাইকে। ভাইয়ের হয়তো লুব্ধককে খুব পছন্দ হয়েছিল। তাইজন্য কালপুরুষের পায়ের কাছে অবস্থানটা মোটামুটি ঠিকঠাক দেখিয়ে দিতে পারল। দারোয়ানজি যে

ভাইয়ের দেখানো সেই বিশেষ তারাটার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

ভাই : উসকা নাম পতা হ্যাঁয় আপকো? (মানে, ওটার নাম জানা আছে আপনার?)

দারোয়ানজি : নহি বাবা। নহি তো ! (না বাবা। জানি না তো।)

ভাই : উসকা নাম হ্যাঁয় দারোয়ান তারা' । (ওটার নাম দারোয়ান তারা ।)

দারোয়ানজি হাঁ হয়ে গেল।

দারোয়ানজিঃ সচ বাবা? (সত্যি বাবা?)

ভাই মুচকি হেসে ফিজিকসের পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়াল।

ভাইঃ আচ্ছা দারোয়ানজি, আপকো ওহ্ চন্দা দিখা?

এবার আর আঙুল দিয়ে দেখাতে হল না, দারোয়ানজি নিজে থেকেই এক ঝলক দেখে নিল চাঁদের দিকে। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

দারোয়ানজি: হা বাবা ! ওহ্ রহা চন্দা। (হ্যাঁ বাবা। ওই তো চাঁদ।)

ভাইঃ আপকো পতা হ্যাঁয় দারোয়ানজি ? ওহ্ চন্দা না, মর গিয়া।

(আপনি জানেন দারোয়ানজি ? ওই চাদটা না মরে গেছে) অর্থাৎ মরা চাঁদ আর কি ! মায়ের গল্পে সেই শিলঙের মরা চাঁদের ব্যাপারে বরাবরই কৌতুহল ছিল ভাইয়ের। চাঁদটা মরে গেলে যে ঠিক কীরকম দেখতে হয়, তা নিয়ে সিরিয়াসভাবে চিন্তাও করেছে হয়তো। কে জানে ! আজ যখন মেঘ কেটে ওঠা চাঁদটাকে দেখে মা ডিক্লেয়ার করল যে এটা মরা চাঁদ তখন বেশ আনন্দ পেয়েছিল ভাই।বেশ কয়েকবার মরা চাঁদ, মরা চাঁদ করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু চাঁদের মরে যাওয়াটা দারোয়ানজির কাছে মোটেই শুভ ঠেকল না। প্রথমে কিছুক্ষণ হতভম্ব ভাবে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল দারোয়ানজী, তারপর.....

দারোয়ানজিঃ নহি নহি বাবা। চন্দা মরেগা কিঁউ? চন্দা তো জিন্দা হ্যাঁয়। ওহ্ দেখো, ক্যায়সে মুস্কুরা রহা হ্যাঁয় ? (না, না, বাবা। চাঁদ মরবে কেন? চাঁদ তো বেঁচে রয়েছে। ওই দেখ কি সুন্দর হাসছে?)

ভাইঃ নহি নহি। ওহ্ তো মর গিয়া হ্যাঁয়। (না না। ও তো মরেই গেছে।)

তারপর বেশ কিছুক্ষণ এই এক কথা নিয়ে ঝগড়া চলল। চাঁদ বেঁচে আছে না মরে গেছে। আমি আর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম না। আরেক রাউন্ড হেঁটে নিলাম বাড়ির চারপাশে। ফিরে এসে দেখি নতুন গল্প শুরু হয়েছে দুই বন্ধুর।

ভাই: দারোয়ানজি, আপকে ঘর মে কওন কওন হ্যাঁয়? (আপনার বাড়িতে কে কে আছে?)

দারোয়ানজি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে মাথা নিচু করল।

দারোয়ানজি: ওহ্, এক দিদি হ্যাঁয়, এক ভইয়া হ্যাঁয়। (দিদি অর্থাৎ দারোয়ানজির মেয়ে আর ভইয়া অর্থাৎ দারোয়ানজির ছেলে।)

ভাইঃ অওর কওন হ্যাঁয়? (আর কে আছে?)

দারোয়ানজিঃ অওর ওহ্ হ্যাঁয়। (আর উনি রয়েছেন।)

দারোয়ানজির লজ্জায় মাথা নামানো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেই উনিটি আসলে কে। দারোয়ানজির গৃহিনী ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কিন্তু আমার পাঁচ বছর বয়সের ভাইয়ের এইসব বোঝার বয়স হয়নি, অতএব সে জিজ্ঞেস করতেই থাকল।

ভাইঃ ওহ্ , 'ওহ্' কওন হ্যাঁয়? (সেই উনিটা কে?)

দারোয়ানজি আরও লাল হয়ে গেল। মাথাটা যতটা সম্ভব নিচু করে নিল ।

দারোয়ানজি: ‘ওহ্' ওহ হ্যাঁয় বাবা। (উনি তো উনি বাবা।)

ভাইঃ সমঝ গিয়া। ওহ্ আপকা কম্পিউটার হ্যাঁয়! (বুঝেছি ওটা আপনার কমপিউটার।)

ভাইয়ের মুখে বিজয়ীর তৃপ্ত হাসি, যেন এক্ষুণি যুদ্ধ জয় করে এল। আধবোজা চোখে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। কিন্তু দারোয়ানজি বিচলিত হয়ে পড়ল। তার এত সাধের ঘরণীকে কম্পিউটার বানিয়ে দেওয়াটা তেমন পছন্দ হয়নি তার।

দারোয়ানজিঃ নহি বাবা, ওহ্ কমপিউটার নহি হ্যাঁয়। (না বাবা, উনি কম্পিউটার নন।)

ভাইঃ সমঝ গিয়া, ওহ্ আপকা ওয়াশিং মেশিন হ্যাঁয়।

দারোয়ানজি: নহি বাবা।

তারপর, দুই বন্ধুর তর্ক চলতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম আরেক রাউন্ড দিতে। চাঁদের নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ঠান্ডা হওয়া গাছের পাতাদের নাড়িয়ে ঝিরঝির শব্দ তুলছে। জমে থকা জলে পড়েছে মরা চাঁদের ছায়া। তার মধ্যে অসমবয়স্ক অথচ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুর গল্প, তর্ক, কথাবার্তা চলতে থাকল।

ঠাম্মা

সেবার জুন মাসে আমারা চারজন - মানে বাবা, মা, ভাই আর আমি চলে এলাম ভোপালে থাকতে। নতুন জায়গা কীরকম হবে, বাড়িটাও বা কেমন হবে তা নিয়ে সবার বেশ চিন্তাই ছিল। অতএব আমার আশি বছরের ঠাম্মাকে আমাদের পৈত্রিক বাড়িতেই রেখে আসা হল। ঠাম্মার সঙ্গে রইল ইতিমাসি। বাউলপাড়ায়, আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে থাকত আরও দুজন, আমার বাবার কাকিমা মানে আমার কাকাঠাম্মা আর তাঁর ছেলে, মানে আমার কাকা। আশেপাশে আরও অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল, তাই ঠাম্মাকে আমরা বেশ নির্ভয়েই রেখে এসেছিলাম বাউলপাড়ায়।

তবে ভোপালে এসে দেখা গেল ভয় পাওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই। জায়গা, বাড়ি সবই ভাল। খুব তাড়াতাড়িই আমরা সবাই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলাম। অতএব সে বছরই পুজোর পর ঠাম্মাকে ট্রেনে করে নিয়ে আসা হল ভোপাল। তবে আনাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না কারণ আমার ঠাম্মা নড়তে চড়তে পারে না মোটেও। বাথরুম নিয়ে যাওয়া থেকে উঠে বসিয়ে দেওয়া, সবই করে ওই ইতিমাসি।

সে যাই হোক ঠাম্মার ভোপালে আসার ঠিক পরপর কোন এক ছুটির দিনে সন্ধেবেলা আমরা সপরিবারে পেছনের বাগানে বসে আড্ডা মারছিলাম। চা-বিস্কুট খাওয়া হচ্ছিল। তখন ইতিমাসিকে ধরা হল, তোমরা বাউলপাড়ায় এতদিন একসাথে কাটিয়ে এলে, তার কিছু গল্প বল না। প্রথমে তা-না-না-না করলেও অনেক ধরাধরি করবার পর শেষ পর্যন্ত ইতিমাসি ওদের বাউলপাড়ায় থাকাকালীন কিছু ঘটনা আমাদের গল্প করে বলল।

প্রথম ঘটনাটা ঠিক এইরকম। বাউলপাড়ায় থাকাকালীন ঠাম্মার সঙ্গে সব সময় থাকতে হত ইতিমাসিকে। আর যথারীতি, ঠাম্মার সমস্ত কাজও করতে হত ওই ইতিমাসিকেই। এইসব দেখে ঠাম্মা কিছুদিন ধরে মাসিকে তারঁ কিছু সম্পত্তি দান করবার কথা ভাবছিল। তাই জুলাই মাসের কোন এক অন্ধকার সন্ধেবেলায় ঠাম্মা ইতিমাসিকে তলব করল। সে তখন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা দিচ্ছিল।

ইদানিং কালে ঠাম্মার সঙ্গে ইতিমাসির একটু ঝগড়াই চলছিল। ঠাম্মার ধারণা বাড়ির বাইরে অষ্টমীর পুজো চলছে, কিন্তু ইতিমাসি ইচ্ছে করে তাঁকে বের করছে না। ফোনে বাবাকে এ ব্যাপারে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছে। তবে ঠাম্মার জড়িয়ে আসা কথা খুব একটা বোঝা যায় না, অতএব বাবাও কিছু বোঝেনি আর ঠাম্মা হাজার চেষ্টা করেও বাবাকে এই অন্যায়ের কথাটা বোঝাতে পারেনি। এই কারণেই হোক আর অন্য কারণেই হোক, মনে মনে একটু বিরক্তই লাগল ইতিমাসির। কাজের মধ্যে এমন চিল্লা-মিল্লি! কিন্তু বিরক্তি লাগলেও

তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা দেওয়াটা শেষ করে ঠাম্মার ঘরে চলে এল সে। তবে ঘরে ঢুকে বিরক্তিটা কেমন যেন চলে গেল।

চেয়ারে বসেছিল ঠাম্মা। চোখ গোল গোল করে তাকিয়েছিল দরজার দিকে। ইতিমাসি ঠাম্মাকে এরকম ভাবে কখনও দেখেনি, অতএব খুব অবাক লাগল তার। ঠাম্মা হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। ইতিমাসি দরজার কাছ থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? ধন-মনকে ফোন করবেন?' ঠাম্মার কথায় ধন হচ্ছে আমার ভাই আর মন হচ্ছি আমি। বাউলপাড়ায় থাকাকালীন সেই সময়গুলোয় ঠাম্মা মাঝে মাঝেই ইতিমাসির কাছে জেদ ধরত ভোপালে আমাদের বাড়ির নম্বর ধরে দিতে, 'ধন-মন' - এর সঙ্গে কথা বলবে। তাই শুরুতেই ইতিমাসির সন্দেহ হল যে হয়তো ঠাম্মা সন্ধেবেলা আমাদেরই ফোন করতে চাইছে। কিন্তু এর উত্তরে ঠাম্মার দুদিকে মাথা নাড়া দেখে ইতিমাসির সন্দেহটা বাড়ল। এই ভর সন্ধেবেলা কী হল হঠাৎ?

আস্তে আস্তে ঠাম্মার দিকে এগিয়ে গেল ইতিমাসি। ঠাম্মা অস্বাভাবিক রকম গোলগোল চোখে তাকিয়ে ছিল। কাছে আসতেই ইশারায় আরও কাছে আসতে বলল ঠাম্মা। ইতিমসি ঝুঁকে মাথাটা ঠাম্মার মুখের কাছে আনল যাতে ঠাম্মার অস্পষ্ট কথাবার্তা ভালো করে শুনতে পাওয়া যায়। ঠাম্মা ফিসফিস করে বলল, 'ইতি, শোন, তুই এই যে আমার জন্য এত কিছু করছিস, আমার সমস্ত কাজ-কর্ম করে দিচ্ছিস এটা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

ইতিমাসি অবাক হয়ে গেল। ঠাম্মা আগে কখনও এরকম ভাবে কথা বলেনি। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী বললেন?' ঠাম্মা তার গলার স্বর আরও নীচুতে নামিয়ে বলল, 'বুঝলি এরা মানে আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ তো আমায় দেখে না। তুই আমার সঙ্গে থাকিস, আমার সমস্ত কাজকর্ম করে দিস। তোকে আমি কিছু দিয়ে যেতে চাই।' ইতিমাসি বোকার মতো প্রশ্ন করল, 'কী দিতে চান আপনি?' ঠাম্মা চোখ দুটো আরও বেশি গোল গোল করে বলল, 'তোর সেবা-যত্নে খুশি হয়ে আমি তোকে এই বাড়িটা দান করে দিতে চাই। ইতিমাসি অবাক হয়ে ঠাম্মার দিকে তাকাল। দিকে। এবার ঠাম্মা আরও আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলল, 'যা খাতা পেন নিয়ে আয়, তোকে বাড়িটা উইল করে দিয়ে দি। তুই যা আমার জন্য করিস, এটা তারই পুরস্কার।'

ইতিমাসি এর মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝল না কিন্তু ঠাম্মার ইশারায় তাড়া দেওয়া দেখে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে খাতা আর পেন নিয়ে এল। ঠাম্মার হাতে পেনটা ধরিয়ে দিয়ে তার সামনে খাতাটার একটা সাদা পাতা মেলে ধরল ইতিমাসি। ঠাম্মা পেনটা হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক করে ধরল, তার পর সেটাকে নিয়ে খাতার ওপর লেখা শুরু করল। ঠাম্মার হাত কাঁপছিল। অনেকদিন পর আবার লেখা। ইতিমাসি একবার খাতাটা ঘুরিয়ে দেখতে যাচ্ছিল ঠাম্মা কী উইল করছে, কিন্তু ঠাম্মা সেটা হতে দিলে তো। ইতিমাসিকে কিছুতেই দেখতে দিল না, কী ধরণের উইল লিখছে।

বেশ অনেক্ষণ ধরে কিছু একটা লেখার পর ঠাম্মা হঠাৎ লেখা থামাল। ইতিমাসি লেখা শেষ হয়ে গেছে ভেবে খাতাটা টেনে নিজের দিকে আনতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠাম্মা সেটা করতে দিল না। আবার নিচে কিছু একটা লেখা শুরু করল। দ্বিতীয় বার অবশ্য লিখতে বেশি সময় লাগল না ঠাম্মার। মিনিট খানেকের মধ্যেই লেখা শেষ করে খাতাটা নিজে থেকেই এগিয়ে দিল ইতিমাসির দিকে। ইতিমাসির এবার আবার সন্দেহ হতে লাগল। কিছুক্ষণ আগেও ঠাম্মার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর, সিরিয়াস ধরনের ছিল, তাহলে এখন এরকম মুচকি মুচকি হাসছে কেন এখন? ইতিমাসি আর দ্বিরুক্তি না করে খাতাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল কী লিখেছে ঠান্মা। খাতার সাদা কাগজে কাঁপা কাঁপা হাতের লেখায় লেখা ছিল,

"সেবা যত্নে খুশি হয়ে আমি আমার সঙ্গী ও সেবিকা ইতি সরকারকে আমার বাউলপাড়ার বাড়িটি দান করলাম।”

ইতিমাসি এক ঝলক ঠাম্মার দিকে তাকাল। ঠাম্মার মুখে একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। ইতিমাসি আবার মুখ ফিরিয়ে উইলটাকে দেখতে লাগল। আগেরবার যেটা দেখতে পায়নি, পাতার নিচে লেখা সেই এক লাইন এবার ইতিমাসির চোখে পড়ল। ঠাম্মা বিশেষভাবে ছোট ছোট করে লিখেছে এই এক লাইন,

‘ধন-মনের বাড়ি, আমি দেওয়ার কে?’

ঠাম্মার হাসিটা আর আগের মতো মুচকি মুচকি নেই। তার বদলে রয়েছে একটা বিশাল বড় অন্যরকম হাসি।

সোনার জন্য চিঠি

প্রিয় সোনা

এবার গরমের ছুটিতে তোদের ওখানে যেতে পারলাম না। একটুও ভাল লাগছে না জানিস? এখানে ভীষণ গরম। ঘরের মধ্যে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি ছুই ছুই করছে। লু হাওয়া শরীর থেকে সমস্ত জল নিয়ে শুকনো করে দিয়ে চলে যায়। কলকাতায় অতটা গরম নয় নিশ্চয়ই। এবার আমার মাধ্যমিক তোর উচ্চমাধ্যমিক। মা তো বলে সারাদিন ঘরে বসে পড়ো পড়ো আর পড়ো। তোরও নিশ্চয়ই একই অবস্থা।

সেই মনে আছে তোর আমি প্রতিবার গরমের ছুটি পড়তেই বাবার সাথে ট্রেনে চড়ে চলে আসতাম তোদের বাড়িতে। সেই টানা দু তিন সপ্তাহ থাকতাম ওখানে। কি মজা হত। আমি তখন হয়তো ক্লাস টু আর তুই ফোরে পড়িস। আমরা বেশির ভাগ সময়, না, প্রায় সব সময় একটাই খেলা খেলতাম - গরিব গরিব খেলা। তুই আর আমি দুই বোন, আর একটা পুতুল হত আমাদের ছোট বোন। আর যথারীতি আমরা খুব গরিব। আমাদের একটা ঝুপড়ির মত বাড়ি একটা পচা ডোবার ধারে। এসব আমরা তোদের বাড়ির ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় খেলতাম। রান্নাবান্নার জন্য নিচে রান্নাঘর থেকে মশলাপাতি আনতে যেতে হত আমাকেই। তুই সব সময় বলতিস যে আমি বেড়াতে এসেছি। তোদের বাড়ির অতিথি। আমি চাইলে সেজোপিসি মশলাপতি ঠিক দিয়ে দেবে। সেজোপিসি বোধহয় সবই বুঝত। তোরই মা তো ! তারপরে তোর রান্নাবান্না হয়ে গেলে আমরা খেতাম। তুই যেহেতু বড়, পুতুল বোনকে খাওয়ানোর দায়িত্ব সবসময়ই তোর ছিল। তারপর আমরা মাদুর পেতে আমাদের কাল্পনিক ঝুপড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম। আর ঠিক সেই সময়ই আমাদের পুতুল বোনের রক্ত বমি হত। প্রতিবার এই এক ছকেই চলত খেলা। যাইহোক তারপর পুতুল বোনের অসুখ সারাতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত আর যথারীতি খুব দামি ট্রিটমেন্ট। অতএব বেরিয়ে পড়তাম ভিক্ষে করতে। তুই অতটুকু বয়সেও রাস্তার ভিখিরিদের খুব ভালো নকল করতে পারতিস। তাই পুতুল কোলে তুই আর তোর হাত ধরে আমি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াতাম তোদের ছাদে। তারপর কী হবে সে সব তুইই ভেবে বের করেছিলিস। সে একেবারে হিন্দি সিরিয়ালের গল্প। ভিক্ষা করেও যথেষ্ট পয়সা না পেয়ে বোনের অসুখ সারানোর জন্য আমরা যজ্ঞ করতে বসতাম। ইতিমধ্যে তুই সিনেমা দেখে দেখে বেশ কয়েকটা পপুলার মন্ত্র জানতিস। সেইগুলো তুই বেশ দখলের সাথেই বলতিস আর তোর পিছন পিছন আমিও আমার অপটু উচ্চারণে মন্ত্রগুলো যথাসাধ্য বলার চেষ্টা করতে থাকতাম |

এই যজ্ঞের কথায় একটা ঘটনার কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। তোরও হয়তো মনে আছে। সেদিন সন্ধেবেলা আমরা আমাদের ফেভারিট গরিব গরিব খেলা খেলছিলাম। খেলা হচ্ছিল তোর ঠাম্মার ঠাকুরঘরে। খেলা তখন জমে উঠেছে। বোনের অপারেশনের টাকা জোগাড় করতে পারিনি বলে তখন যজ্ঞ করার কথা ভাবা হচ্ছে। তখনই হঠাৎ ঠাকুরের আসনের কাছে জলন্ত প্রদীপটাকে দেখে ঠিক করা হল আজকে সত্যি সত্যিই যজ্ঞ করা হবে। অতএব ঠাকুরের নিজস্ব রিজার্ভ থেকে নেয়া হল তেল আর ঘি। প্রদীপটায় ফিল্মি কায়দায় ঢালতে লাগলাম তেল আর ঘি। আমার কাজ ছিল দরজাটাকে গার্ড দেওয়া। ওই দরজাটায় কোনও ছিটকিনি ছিল না। যজ্ঞটা কতক্ষণ চলেছিল মনে নেই। আমাদের পুতুল বোনের সেরে উঠার আনন্দে আমরা যজ্ঞের আগুনের চারধারে নাচছি এমন সময় সেজোপিসির ডাকে আমাদের টনক নড়ল।

সেজোপিসি ভাত খেতে ডাকছিল আমাদের দুই বোনকে। তারপর আগুন জালাবার প্রমান লোপাট করতে তুই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বোতল জল ঢেলে দিলি যজ্ঞের আগুনের উপর। কিন্তু ফল হল উল্টো। আগুনের শিখাটা আরও বেশ পাঁচ হাত মতো উঁচুতে উঠে গেল। সেজোপিসি আমাদের অনেকবার ডাকা সত্ত্বেও সাড়া না দেওয়াতে নিজেই চলে এল ঠাকুরঘরে, কী হয়েছে তার খোঁজ নিতে। দরজা খুলেই দেখলো ঘর ভর্তি ধোঁয়া আর আমরা দুই বোন কাশতে কাশতে বেরোচ্ছি। কী বকটাই না খেয়েছিলাম সেদিন ! তারপর থেকে গরিব গরিব খেলা হলেও যজ্ঞটাকে বেশ একটু এড়িয়েই চলতাম আমরা।

অনেক কিছু লিখে ফেললাম বল? চিঠিটা পড়িস কিন্তু। এই গরমের ছুটিতে হল না কিন্তু পরের ছুটিতে কিন্তু আসবই আসবো। খুব মজা হবে।

ভালো থাকিস
ঝিলিক

বাবাইদাদার উপহার

‘খড়মড় খড়মড়’ শব্দ করে রঙিন মোড়কটা খুলতে লাগল সোনাই। বনি দেখল, কী সুন্দর লাল কাগজ, ওপরে সোনালি ফিতে! মোড়ক খুলেই সোনাইয়ের চোখ গোলগোল হয়ে গেল। বনির দিকে চেয়ে বলল, ‘যাঃ এবার কী হবে ?’ বলেই ক্যাও ম্যাও করতে করতে পালিয়ে গেল। বনি এবারে এগিয়ে এল। উপহারের বাক্সের মধ্যে একটা স্পঞ্জ ছিল, তার ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে কমলা রঙের একটা মাকড়সা। মোড়কটার ওপর আঠা দিয়ে একটা কার্ড লাগানো। সেখানে লেখা, ‘সোনাইকে, তার দাদা বাবাই।’ সোনাই বনিদের বাড়িতে একমাসের জন্য বেড়াতে এসেছে। বাড়িতে ওর দাদার সঙ্গে কুকুর আর বিড়ালের মত সম্পর্ক। সেই দাদা আবার সেধে সোনাইকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা নিজের চোখে দেখেও বনির বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বনির ছোট ভাইটা হঠাৎ লেবু চুষতে চুষতে এ ঘরে ঢুকল। মোড়কটা নিয়ে খচমচ আওয়াজ করতে লাগল। মাকড়সাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল। সোনাই এতক্ষণ রান্নাঘরে বসে ছিল। এবার ভয়ে ভয়ে ফের ঘরে ঢুকল। হঠাৎ বাক্সটার মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট রিমোট না কি যেন তুলে নিয়ে বলে, ‘এটা কি রে বনি?’ বনি বলল, ‘ভগবান জানে।’

সোনাই ততক্ষণে ওটা টিপতে শুরু করেছে। ওমনি মাকড়সাটা নড়তে শুরু করল। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সোনাইয়ের পায়ের কাছে ওটা চলে এল। সোনাই হঠাৎ করে একটা লম্বাটে বোতাম বেশ জোরে টিপতেই মাকড়সাটা এক লাফে সোনাইয়ের মাথার ওপরে গেড়ে বসল। তখন সোনাইয়ের চিৎকারের বহর আর দেখে কে? বনি কানে হাত চাপা দিল। সবাই দৌড়ে এল। এমনকি বনির ভাইও । ততক্ষণে সোনাই অজ্ঞান। এক ঘন্টা পরে ওর জ্ঞান ফিরেছিল। তাও মগ মগ জল ছেটানোর পর। বাড়ি ফিরে ওর দাদার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন কথা বন্ধ ছিল। কিন্তু এ ঘটনা থেকে সোনাই বুঝেছিল, লোকে কেন বলে সব জিনিস দেখেশুনে করতে হয়।

ছাত্রী

দুপুরবেলা যে আমি কী করি সেটা কেউ জানে না। জানবেও বা কেমন করে? ঘড়িতে যখন ঠিক দুটো বাজে তখন আমি বইখাতা বগলে উঠে যাই ছাদের ঘরে। দীপা মাসি ভাবে আমার পড়াশোনায় মন বসেছে, দুপুরবেলা টিভি না দেখে বই নিয়ে বসছি। রোজ বিকেলে এটা-সেটা বানিয়ে দেয়। মার কাছে বলে - 'বৌদি আজকাল না দুপুর হলেই দিদিভাই ছাদের ঘরে পড়তে বসে। একটুও টিভি দেখে না। কাউকে ডিশটাপ (ডিস্টার্ব) করে না।' মাও তাই শুনে মুচকি হাসে। কিন্তু আসলে যে তখন আমি কী করি তা সত্যিই কেউ জানে না।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল মাসখানেক আগে। এই বাড়িতে তখন আমরা সবে এসেছি। দোতলা সুন্দর বাড়ি। খুব সস্তায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাড়াটাও খুব ভালো। অতএব বাড়ি কেনা হল। ঘুপচি ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে সপরিবারে চলে এলাম। তখনও নতুন বাড়িতে টিভি লাগান হয়নি। দুপুরবেলাটা আমার কিছুই করার থাকে না। হোমওয়ার্ক করার বাঁধাধরা সময় হচ্ছে সন্ধে সাতটা থেকে রাত সাড়ে নটা। সেটাতে তো বদল আনা যায় না! সেই কবে থেকে নিয়মটা চলে আসছে।

সেদিন দুপুরটা ছিল অন্য দিনগুলোর থেকে একটু আলাদা। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদের বদলে একটু একটু মেঘ করেছে। পুব দিক থেকে ভেজা ভেজা হাওয়া দিচ্ছে। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হবে। মেঝেতে একগাদা বইখাতা নিয়ে বসেছিলাম আমি। একটা পুরোনো খেলা খেলবার চেষ্টা করছিলাম - পড়ানো। আগে ছোট থাকতে নিজের সামনে পুতুল সাজিয়ে নিয়ে বসতাম পুরোনো ক্লাসের বই নিয়ে। রোল কল নিতাম পুতুল ছাত্রছাত্রীদের। পড়া না পারলে পুরীর লাঠি দিয়ে মারতাম। আরও কত কি এখন তো আর সে সব করা যায় না! বড় হয়ে গেছি (!) । ক্লাস সিক্সে পড়ি। এখন ক্লাসের বই নিয়ে বসে ও ঘরের আসবাবপত্রকেই পড়াই হয়তো।কিন্তু যাকেই পড়াই, পড়াই তো!

সেদিন পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম একটু। জানলার বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। এমন সময় একটা খসখস আওয়াজে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। বেশ ভয়ই পেয়ে গেলাম। কোথেকে আসছে আওয়াজটা? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। না, সত্যিই কেউ নেই। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম। সেখানেও সেই একই জিনিস। একটা কাক-পক্ষীকেও দেখছি না। তাহলে আওয়াজটা কে করছে? ঘরে ফিরে এলাম। এখন খসখস আওয়াজটা আর নেই। সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ। নীরব।

তখনই স্লেটটার ওপরে চোখ পড়ল। স্লেটটা আমি আজ পর্যন্ত কখনও ব্যবহার করিনি। কিন্তু যখন আমি পড়াতে বসি তখন ওটা একটা মাস্ট। স্লেটটা ছাড়া ঠিক যেন ভাল করে পড়ানো যায় না। বাবাকে দিয়ে চকও আনানো হয়েছে এক বাকসো। তাই দিয়েই স্লেটে লিখি। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে সেদিন আমি কিছুই

লিখিনি। চোখে পড়ল কাঁপা কাঁপা বাংলা হাতের লেখায় লেখা দু খানা বাক্য। কাছে গিয়ে স্লেটটা হাতে নিলাম। তাতে লেখা ছিল- 'কী হল? আজ পড়াচ্ছো না যে? মন খারাপ?'

কি মনে হতে আমিও স্লেটের ওপরে লিখলাম, 'ইচ্ছে হচ্ছে না। তুমি কে গো?'

ওমনি আবার স্লেটে নিজে থেকেই লেখা ফুটে উঠল। তারপর স্লেটে লিখে লিখে ও তার নিজের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আমায় জানাল। ওর নাম লেখা। এই বাড়ির আগের বাসিন্দাদের মেয়ে। বছর দশেক আগে সে এখানে তার বাবা, মা, দিদিদের সঙ্গে থাকত। বাড়িটা ওর দাদুর বানানো, তাই একটু সেকেলে ধরনের। একদিন সন্ধেবেলা বাগানে ঘুরছিল লেখা। ওর বয়স তখন এগারো। সেটা মার্চ মাস। হালকা হাওয়া বইছে। সব কিছু কি সুন্দর! কি অপূর্ব! ও মনে মনে ভেবে চলেছিল ওর নিজের কথা। কোন কিছুরই অভাব নেই তার। একটা ঠিকঠাক পরিবার, একটা এত সুন্দর বাড়ি! আর কী চাই? মনে মনে ভগবানের কাছে ও বলেই ফেলল, 'হে ভগবান। আমার আর যাই কর আমাকে কখনও এই বাড়ি বা এই পরিবারের কাছ থেকে আলাদা কোরো না। ইচ্ছা ঠাকরুণ হয়তো কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। এহেন ইচ্ছা শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন -'তথাস্তু।'

ব্যাস! হয়ে গেল। তার দিন দুয়েক পর লেখা সকালবেলা উঠে দেখল সে নিজেকে আর দেখতে পাচ্ছে না। মশারি তুলে বেরোল সে। খাটে শুয়ে ঠাণ্ডা স্থির তার শরীরটাকে দেখে খুব উদাস লেগেছিল তার। এই ঘটনার দিনদশেকের মধ্যে লেখার বাবা-মা-দিদি বাকসো-টাকসো বেঁধে চলে গেল অন্য কোথাও । কোথায় সেটা কেউ জানে না। ও কিন্তু আটকে গেল এই বাড়িতেই। ইচ্ছাঠাকরুণ হয়তো তার ইচ্ছার প্রথম ভাগটাই শুনেছিল।

গত দশ বছর বাড়িটা বন্ধ ছিল। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, মন কেমন করত। কিন্তু একা থাকাটা একরকম সয়ে গেছিল ওর। এই বাড়ি আগলে, সব কিছু আগলে পাহারাদার হয়ে ছিল সে। কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ি অপরিস্কার হতে লাগল। ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ল আসবাবপত্রের ওপর। ফুলগাছগুলো মরে গিয়ে তাদের জায়গায় গজিয়ে উঠল আগাছা। বাগানটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেল। ফাঁকা বাড়িতে বর্ষাকালে ছ্যাঁতলা পড়ল। ঘুঘুপাখি বাসা বানাল জানালার ধারে।

ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল এই বাড়িতে এখন জীবন্ত লোক থাকতে না এলে সত্যিই এর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। একটা অজানা আশঙ্কা আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছিল ওর মনটাকে। বাড়িটা যদি ভেঙে যায়, কিংবা যদি নষ্ট হয়ে যায়, ও তাহলে কোথায় যাবে? কোথায়ই বা থাকবে?

তারপর একদিন সকালে কিছু লোকজন এল। বাড়ি দেখল। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করল সব কিছু। ভাঙা জিনিসপত্র সারালো। জানালার কাচ ঠিক করল। বাগানের আগাছা সরিয়ে ফুল গাছের চারা লাগাল ।

তারপর এলাম আমরা। খুব খুশি হয়েছিল ও সেদিন। কিছুদিনের মধ্যেই আমার এই পড়ানোর অভ্যাসটা চোখে পড়ল ওর। আর সেই থেকে আবার শুরু হল ওর পড়াশোনা। আমি রোজ পড়াই। আর ও রোজ পড়ে।

এতগুলো কথা লিখে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে গেছিল ও। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ওর সত্তাটাকে। ঠিক যেন আর একজন মানুষ। খালি ওকে চোখে দেখা যায় না এই যা। মনে পড়ছিল সেই বাঙ্গালোরের আধুনিক মহিলাকে, যার কাছ থেকে বাবা বাড়িটা কিনেছে। তিনিই হয়তো আমার ছাত্রীর দিদি। কে জানে!

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম চিন্তা করতে করতে। চমক ভাঙল আবার সেই খসখস শব্দে। এবার আর এদিক ওদিক তাকাতে হল না। সোজা স্লেটটার দিকেই তাকালাম। তাতে আবার কিছু লেখা ছিল-'কী হল? আজ কি পড়াবেই না? আমি চলে যাব?' ওর লেখাতে ছিল অনুরোধের সুর। আমি বইটা হাতে নিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলাম। শুরুতে বেশ অদ্ভুতই লাগছিল। আমি কাকে পড়াচ্ছি? কেন পড়াচ্ছি? - এই সব প্রশ্ন জাগছিল মনে। কিন্তু আস্তে আস্তে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। আমি পড়াতে লাগলাম আপনমনে, যেমনি আগে পড়াতাম।

ভয় পাওয়ার চেয়ে আমি খুশিই হচ্ছিলাম বেশি। মনেই হচ্ছিল না যে আমি কোন ভূত বা কোন মরা মানুষের আত্মাকে পড়াচ্ছি। শুধু মনে হচ্ছিল যে একজনকে পড়াচ্ছি। আমার ছাত্রীকে পড়াচ্ছি। ও-ই প্রথম এমন কোন মানুষ (বা ভূত) যে আমার পড়ানোকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নিয়েছে। এর আগে, ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে পাশের বাড়ির ভূতোকে পড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। ভূতো রোজ বিকেল চারটেতে আমার কাছে আসত আর রোজ পাঁচটায় মায়ের কাছে ফেরৎ যেত। আর এই একঘন্টা যে কি হত তা না বলাই মঙ্গল। ভূতো কালা ছিল বলে জানতাম না। কিন্তু পড়তে বসে কালা হয়ে যাওয়াটা হয়তো ওর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ওকে যত কিছু বলি, যা কিছু বলি ওর মাথায় যদি কিচ্ছু ঢুকত ! বোকার মত কেবল তাকিয়ে থাকত আমার দিকে।

আমার নতুন ছাত্রী অন্তত সেরকম নয়। তার প্রমান পেয়েছি যখন তখন স্লেটের ওপর অঙ্ক-কষা দেখে। হয়তো ও আমায় প্রমান দিতে চায় যে ও পড়ছে, ও বুঝছে, ওর ভালো লাগছে।

তাই আমি রোজ দুপুরবেলা উঠে যাই ছাদের ঘরে আর সারা দুপুর ধরে পড়াই ওকে। এখন বাড়িতে টিভি লাগানো হয়ে গেছে। তবে আর দেখতে ভাল লাগে না। দুপুরবেলায় আমার এখন কত কাজ বলো তো! এত কাজের চাপ থাকলে কী করে টিভি দেখে সময় নষ্ট করি?

মুখার্জি অদৃশ্য

মুখার্জিবাবুকে আমি কখনো নিজের চোখে দেখিনি। আর দেখতে চাইও না কখনও। সামনাসামনি দেখতে পাওয়াটা অবশ্য এই মুহূর্তে সম্ভবও নয়। কারণ ওঁর কারেন্ট রেসিডেন্স এই মুহূর্তে হচ্ছে পরলোক। তবে ওঁকে ঘাঁটানোর ফল যে কী হতে পারে তা আর কেউ না বুঝক, আমি বা আমার বাড়ির সকলেই বেশ ভাল করেই বোঝে। সেই গল্পই বলা যাক।

মুখার্জিবাবুর গল্প আমি শুনেছিলাম দিম্মার কাছে। সেবার আগস্ট মাসে দিম্মা আর দাদু বেড়াতে এল আমাদের এখানে। একমাস থাকার কথা। তখন বর্ষাকাল। একদিন সন্ধেবেলা জেদ ধরে বসলাম যে দিম্মাকে গল্প বলতে হবে। আর যে সে গল্প নয়, ভূতের গল্প। দিম্মা প্রথমে তো বলেই দিল যে সে ভূতের গল্প বলতে রাজি নয়। কিন্তু অনেক ঝুলোঝুলি করবার পর শেষ পর্যন্ত দিম্মা তার বৌদির মানে আমার মায়ের মামিমার বা আমার মামিদিম্মার একটা গল্প শুরু করল।

গল্পটা দিয়ার ভাষাতেই বলা যাকঃ

বৌদি থাকতেন বালিগঞ্জের কাছে একা একটা তিনতলা বাড়ির দোতলায়। আর মুখার্জিবাবু ছিলেন ওনারই প্রতিবেশী। সেই বাড়িটারই চিলেকোঠায় ভাড়া থাকতেন তিনি। মুখার্জিবাবুর চেহারার বর্ণনা আর নাই দিলাম, তবে এইটুকু বলে রাখি, উনি ছিলেন বিশাল লম্বা। স্বভাবের দিক থেকেও ওনার খুব একটা নাম ছিল না। বাড়ির বাকি সবার সঙ্গে ছিল ওনার রাম ঝগড়া। সংসার কিম্বা ছেলেপুলেও ছিল না। একাই থাকতেন। বৌদির সঙ্গে ওনার খুব একটা ভালো সম্পর্ক কোন কালেও ছিল না। কিন্তু দুজনেরই বয়স হয়েছে, আর তাছাড়া দুজনেই একা থাকেন বলে ইদানিং কালে বৌদির সঙ্গে একটু বন্ধুত্বই হয়ে গেছিল মুখার্জিবাবুর। ছাদেটাদে গেলে বৌদি দুদণ্ড গল্প করে যেতেন মুখার্জিবাবুর সঙ্গে আর মুখার্জিবাবু নিচে নামলে বৌদির সঙ্গে দেখাটেখা করতেন।

এরকমই একটা বিকেলে বৌদি ছাদে মুখার্জিবাবুর সঙ্গে গল্পসল্প করছিলেন। কথায় কথায় সিনেমার প্রসঙ্গ উঠল। মুখার্জিবাবু বললেন, ‘আচ্ছা দিদি, আজকের কাগজে সপ্তাহের সিনেমার লিস্টটা দেখছিলাম। দেখলাম শনিবার দেবদাস হবে। না, না, পুরোনোটা নয়, সেই যে বোম্বের খান না কি, তার করা নতুনটা। আমি তো সেই পুরোনো দেবদাসই দেখেছি।

বৌদি বললেন, ‘শাহরুখ খানের হিন্দি দেবদাস ! ওটার কথাই বলছেন?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই । আসলে কি হয়েছে জানেন দিদি, বড্ড দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে সিনেমাটা। আমরা তো দেখেছিলাম সেই পুরোনো দেবদাস। তাছাড়া, আমার ঘরে টিভিও নেই যে দেখব কিছু।’

‘তা আসুন না আমার ওখানে এই শনিবার। দেখব'খন দেবদাস। আমার তো একটা টিভি আছেই।’

‘তাহলে সেই কথা রইল। আমি আসবো কিন্তু শনিবার দিন।'

কিন্তু শনিবার আর মুখার্জিবাবুকে আসতে হল না। কারণ বৃহস্পতিবার দিন সকালেই তিনি পরলোকগমন করলেন। মুখার্জিবাবুর কাজের মেয়ে প্রতিমা আসে রোজ সকালে, ওনার দুধ নিয়ে। তারপর ওনার ঘরের বিছানাপত্র গুছিয়ে, পরিষ্কার করে চলে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিমা একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছিল। মুখার্জিবাবুর ঘরে যাওয়ার আগে বৌদির সঙ্গে একটু গল্পও করে গেছিল। কিন্তু চিলেকোঠায় পৌঁছেই তার চীল চিৎকার, ‘ও মাসিমা, গো ! শিগগিরি এসো গো ! কি সব্বোনাশ হয়ে গেল গো ! ’

বৌদি দৌড়ে উঠে গেল চিলেকোঠায়। মুখার্জিবাবু বাথরুমের সামনে শুয়ে ছিলেন। গা ঠান্ডা। নিঃশ্বাস পড়ছে না মোটেও। হাত থেকে ওষুধের কোটোটা পড়ে চৌচির হয়ে আছে মেঝেতে, ওষুধটাও ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

সে সপ্তাহে নানা ঝামেলায় বৌদির আর দেবদাস দেখা হয়নি। মুখার্জিবাবুর মৃত্যুর মাস কয়েক কেটে গেছে তারপর। একদিন সকালে বৌদি কাগজ খুলে দেখলেন, সেদিন আবার সন্ধে সাতটায় কোন হিন্দি চ্যানেলে দেবদাস হবে। বৌদির মুখার্জিবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। আহা রে লোকটা এত করে বলেছিল দেবদাস দেখবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেখতে পেল না। দুঃখ একটু হল বটে কিন্তু সন্ধে সাতটায় বৌদি কিন্তু টিভি খুলতে ভুললেন না। দেবদাসটা দেখবার তারও যে অল্পবিস্তর ইচ্ছা ছিল।

বৌদি খাটে বসে একমনে সিনেমা দেখছিলেন। তখন রাত আটটা। হঠাৎ মনে হল খাটের পাশে রাখা চেয়ারে যেন কে বসে আছে। বৌদি টিভি থেকে চোখ সরাতে সাহস পেলেন না। খালি মনে হচ্ছিল চেয়ারে বসে রয়েছে মুখার্জি। কিন্তু সেটা কী করে হতে পারে? তিনি তো মারা গেছেন আজ তিন মাস হল। তাহলে? চেয়ারে তবে কে বসে রয়েছে? বৌদি ঘামতে লাগলেন দরদর করে। মুখার্জিবাব এত করে বলেছিলেন আসবেন দেবদাস দেখতে। সেই ইচ্ছাটাই বুঝি তাঁকে পরলোক থেকে টেনে এনেছে!

সে'রকমভাবে কতক্ষণ যে বসেছিলেন বৌদির জানা নেই। সিনেমা হয়েই চলেছে আর মুখার্জিবাবুও যেন চেয়ারে বসে রয়েছেন। ওঠবার নামটি করছেন না। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। বৌদির খেয়াল হল যে সেদিন আরতির আসার কথা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন একবার চেয়ারটার দিকে। মুখার্জিবাবু ঠায় বসে রয়েছেন। ওদিকে কলিং বেল বেজে চলেছে বার বার। আরতিও সাড়া না শুনে ডাক দিচ্ছে, ‘মাসিমা, ও মাসিমা! দরজা খুলুন!’ কিন্তু বৌদির তো হয়েই গেছে। থরথর করে কাঁপছেন। নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়েই ফেলেছেন।

তারপর একসময়, মনের সমস্ত সাহস একত্র করে বৌদি ছুটলেন দরজার দিকে। কোনরকমে দরজা খুললেন আর দরজা খুলেই এলিয়ে পড়েলেন আরতির কোলে। পরে বৌদির মুখে আরতি সমস্ত কথা শুনে বলেছিল, 'ও মাসিমা, জানেন একবার আমি ছাদে গিয়েছিলাম পেয়ারা আনতে। দেখি চিলেকোঠার ঘরের পর্দাটা সরানো। আমি পর্দাটা ঠিক করে দিয়ে এলাম। সেদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি মুখার্জিবাবু আমায় বকছেন, 'আমার ঘরে উঁকি মারছিলিস কেন রে?' তারপর থেকে আমি, মাসিমা, আর কখনো ছাদে যাই না। সেদিন স্বপ্নে এসেছিলেন, আবার গেলে যদি দেখা দিয়ে দেন!'

দিম্মার মুখে মুখার্জিবাবুর গল্প শুনে আমার মনে হল এটা নিয়ে অনেক কিছু করা যায়। যেমন, সিনেমা বানানো। মুখার্জিবাবুর প্রত্যাবর্তন নিয়ে তো বেশ ভালো এক খানা শর্ট ফিল্ম বানানো যায়! বাড়িতে লোকজনও আছে অনেক। অতএব অভিনেতা-অভিনেত্রীরও অভাব হবে না। দিম্মা এককালে নাটক করত। বাড়ির অন্য লোকেরাও খুব একটা আনাড়ি নয়। আর তাছাড়া দিম্মাদের সঙ্গে ইন্দোরে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান কয়েকদিন পরেই, অতএব কাজ তাড়াতাড়ি শুরু না করলে শেষ আর না-ও হতে পারে। অতএব সেই সন্ধে থেকেই কাজ শুরু করা গেল।

শুরু করলাম স্ক্রিপ্ট দিয়ে। মা-বাবার সঙ্গে বসে মুখার্জিবাবুর গল্প নিয়ে একখানা জম্পেশ স্ক্রিপ্ট বানাতে লাগল এক ঘন্টা মতন। তার শুরুতেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা কে কে হবে সেটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। বৌদি হচ্ছে দিম্মা, মুখার্জিবাবু হচ্ছে দাদু, আরতি হবে রানি মাসি আর মুখার্জিবাবুর কাজের মেয়ে প্রতিমা হবে মা। সিনেমাটা খুব বড় হবে না, বড়জোর দশ মিনিট মতন, তার বেশি কিছু না। ডিজিটাল ক্যমেরা দিয়েই ভিডিও গুলো তোলা হবে - ঠিক করা হল। তারপর সেগুলোকে কম্পিউটারে তুলে সম্পাদনা-টনা করে সিনেমাটা তৈরি হবে। বাড়ির সকলেই খুব উত্তেজিত ! সিনেমা বলে কথা ! অতএব বেশি দেরি না করে পরদিন থেকেই কাজ শুরু করে দেওয়া হল।

সিনেমায় আমিই ক্যামেরাম্যান, আমিই পরিচালক। দিম্মা তাঁর যৌবনে অনেক নাটক করেছে অতএব তাঁকে নিয়ে অসুবিধা হওয়ার কথাও নয়, অসুবিধা হলও না। কিন্তু যত অসুবিধা ওই দাদুকে নিয়ে। দাদু নাটক দেখেছে বিস্তর তবে নিজে একবারও নাটক বা ওই ধরনের কিছু করেনি। বলতে গেলে দাদু এ ব্যাপারে বেশ আনাড়ি। মুখার্জিবাবুর এক একটা সিন দাদুকে দিয়ে মোটামুটি দু-তিনবার করে করাতে হল, তারপরে পছন্দসই হল সেটা।

আমাদের বাড়ির একতলার বসবার ঘরে সাজানো হল বৌদির ঘর, আর ওপরে মায়েদের ঘরে সাজানো হল চিলেকোঠা মানে মুখার্জিবাবুর ঘর। চিলেকোঠার দরজায় তো নেমপ্লেট লাগাতে হবে অতএব একটা সাদা কাগজের ওপর কালো স্কেচ পেন দিয়ে ইংরেজিতে মোটা মোটা অক্ষরে লিখলাম, 'এ কে মুখার্জি'। সেটাকে সেঁটে দিলাম শোবার ঘরের দরজায়। সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন

ওটা মুখার্জি বলে কারো ঘর। ওদিকে শুটিং চলতে লাগল পুরোদমে। রোজ তিনটে চারটে করে সিন শুট করা হচ্ছে। শেষে, মোটামুটি চার-পাঁচ দিন মতন পরে, আমরা শেষ সিনটা শুট করলাম।

এই সিনটাই বলতে গেলে সিনেমার মুখ্য জায়গা। মুখার্জিবাবুর দেবদাস দেখতে আবির্ভাব। বসবার ঘরে সাজানো হল সেট। সবচেয়ে লো ভোল্টেজের আলো জ্বালানো হল যাতে ব্যাপারটা আরও ভূতুড়ে লাগে। টিভিতে বন্ধুর থেকে ধার করে আনা হিন্দি দেবদাসের সিডি চালিয়ে দিলাম। সব মিলিয়ে আসর জমজমাট। যেহেতু এই সিনটায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই, এইবার আর দাদুকে নিয়ে বিশেষ কোন অসুবিধাই হল না আমার। দিম্মাও সবসময়কার মতো একেবারে ন্যাচারাল অভিনয় করল। বেশ সুন্দর ভাবেই শেষ হল শুটিং।

পরদিন শনিবার। আমার স্কুল ছুটি। সকালবেলা সবাই মিলে বসলাম কম্পিউটারের সামনে। এডিটিং করা হবে এবার। বাবা আর আমি দু'জন মিলে করলাম এডিটিং। একের পর এক সিন জুড়ে জুড়ে তৈরি হল সিনেমা। সঙ্গে আরও যোগ হল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আর তার ভিডিও এফেক্ট। তবে সারাদিন কাজ করেও এডিটিং পুরোপুরি শেষ করতে পারলাম না সেদিন। পরদিন আমাদের ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা। সেখান থেকেই দিম্মাদের প্লেনে তুলে দেওয়া হবে। ফলে অসম্পূর্ণ সিনেমাটা কম্পিউটারে রেখে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম পরদিন সকালে। দিম্মা-দাদুদেরও আর তাদের অভিনীত সিনেমা দেখা হল না।

কম্পিউটারে অসমাপ্ত সিনেমাটাকে এমনি এমনি রেখে না গেলেই হয়তো ভালো ছিল। যে লোক দেবদাস দেখবার জন্য একেবারে পরলোক থেকে আবির্ভূত হতে পারে সে যে আরও অনেক কিছুই করতে টরতে পারে এটা আমার বোঝা উচিৎ ছিল। যদি সেই রকম কোন ব্যবস্থা করে যেতাম তাহলে হয়তো এর পরের অঘটনটা ঘটত না।

ইন্দোর যেতে গাড়িতে মোটামুটি লাগে চার ঘন্টা। রবিবার দিন বাড়ি থেকে বেরোন হল ঠিক সকাল ন'টায়। ইন্দোরে পৌঁছুলাম দুপুর একটায়। সেখানকার গেস্টহাউসে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করে, একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওঙ্কারেশ্বরের উদ্দেশ্যে। তারপরের চারদিনে পুরো ওই এলাকার সমস্ত জায়গায় বেড়াতে যাওয়া হল। প্রথমে ওঙ্কারেশ্বর, তারপরে মহেশ্বর , সেখান থেকে মান্ডু, আর মান্ডু থেকে আবার ইন্দোর। বৃহস্পতিবার ইন্দোর এয়ারপোর্ট থেকে দুপুরের প্লেনে দিম্মাদের তুলে দিলাম আমরা সবাই। সিনেমার কথা তখনকার মতন সবাই একটু ভুলেই গেছিলাম হয়তো।

বাড়ি ফিরেই বুঝতে পারলাম যে কিছু একটা ঘটে গেছে। পরিবেশটা এমনিতে খুব একটা না বদলালেও কেমন যেন থমথমে লাগছিল। আমার বিশেষ করে কেমন যেন ভয় ভয় করছিল।

সেদিন রাতে আর এডিটিং নিয়ে বসলাম না। এমনিতেই ঘোরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম, তারপরে গাড়ি করে মাইলের পর মাইল ঘোরার ফলে সকলের মাথা একেবারে বনবন করে ঘুরছিল। খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। বন্ধুকে ফোন করতে সে বলল পরদিন কোন কারণে স্কুল বন্ধ। অতএব শান্তিতে ঘুমোন গেল সারারাত। যাকে বলে এক ঘুমে রাত কাবার।

পরদিন সকালে আবার বসলাম এডিটিং নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেটা নিয়ে এডিটিং করব সেটাই অদৃশ্য। কম্পিউটারের সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও খুঁজে পেলাম না আমার অসম্পূর্ণ সিনেমা। এমন কি, উধাও হয়ে গেছে আমার ক্যামেরা থেকে তুলে আনা ভিডিওগুলোও। রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম, ক্যামেরাতেও খুঁজে দেখলাম, ভিডিওগুলো আছে নাকি। কিন্তু না, কোন লাভ হল না তাতে। ভিডিওগুলো সেখান থেকেও উধাও। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করার পরও কিছুই পাওয়া গেল না। না অসম্পূর্ণ সিনেমাটা, না ভিডিও ক্লিপগুলো। বাবা অফিস থেকে ফেরবার পর আরও একপ্রস্থ খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু না। মুখার্জিবাবুর সিনেমাটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কোন চিহ্নই নেই সেটার। বাড়িতে এতদিন ঠাম্মা আর রানি মাসি ছাড়া আর কেউই ছিল না। আর ঠাম্মা বা রানিমাসি - কারুর পক্ষেই কম্পিউটার চালিয়ে, সিনেমাটা আর ভিডিওগুলো খুঁজে বের করে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাহলে ? কী হয়েছে সেগুলোর ?

বুঝলাম, যে মানুষ দেবদাস দেখবার জন্য একেবারে যমলোক থেকে নেমে আসতে পারে, তাকে ঘাঁটালে ফল ভালো হয় না । একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। মুখার্জিবাবুর হয়তো সিনেমাটা ভালোই লাগেনি। পরে দিম্মা সব শোনবার পর বলেছিল, ‘ভালই হয়েছে, বুঝলি। ওই সব মরা মানুষকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে নেই। আর ওই মুখার্জিবাবু লোকটা সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসত। তাকে নিয়ে উল্টোপালটা সিনেমা বানানোটা উচিৎ হয়নি মোটেই। কম্পিউটারের ওপর একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিস মনে করে। দুর্গা, দুর্গা।’

এরপর থেকে মুখার্জিবাবু হয়ে গেলেন বাড়ির একটা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ। তাকে নিয়ে মজা তো করা আর হয়ই না, কেউ তাঁর ব্যাপারে কথা বললেও মুখ সামলে কথা বলে। মুখার্জিবাবুর নাম লেখা সেই সাদা কাগজটা তারপর অনেকদিন শোবার ঘরের দরজায় লাগানো ছিল। কেউ খুলতে সাহস করেনি সেটা। কিন্তু, আগেরবার সিনেমাটা গায়েব করেছিলেন, এবার যদি দরজাটাও গায়েব করে দেন, এই ভয়ে একদিন আমরা সবাই মনের সমস্ত সাহস একত্র করে সেটাকে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিলাম। মুখার্জিবাবুর শেষ চিহ্নটাও মিলিয়ে গেল অবশেষে। খুব হাল্কা লাগছিল সবার।

তাই বলছিলাম, মুখার্জিবাবুকে কখনও দেখতে চাই না আমি। ওঁকে ঘাঁটানোর ফল যে কি তা তো ভালো করেই বোঝা গেছে।

বারান্দার জানালা

আজকের দিনটা বেশ খারাপ যাচ্ছে বিনির। বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া, অঙ্ক ম্যামের কাছ থেকে বাইরে তাকিয়ে থাকবার জন্য বকুনি আরও কতকি! বিনি জানালার ধারে বসেছিল টিফিন টাইমে। ক্লাসের মেয়েরা সব একে একে টিফিন নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিন হলে বিনিও যেত কিন্তু আজ ওর যা মনখারাপ, কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না। বেঞ্চে এসে বসেছে কয়েকটা মেয়ে। অন্য ক্লাসেরই মনে হচ্ছে। সবার গায়ে একরকম ইউনিফর্ম। জোরে জোরে কথা বলছে ওরা। বিনির বেশ রাগ হতে লাগল।

একসময় মেয়েগুলো আর তাদের হাসিঠাট্টা সমস্ত বিরক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেল। বিনি আর ওখানে বসে থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়াল। গটগট করে বেঞ্চ থেকে বেড়িয়ে চলে এল বারান্দায়। বারান্দার জানালাগুলোতে শিক নেই মোটে, সব বড় বড় ফাঁক। মেয়েরা জানালার ধারে বসে বসে টিফিন খাচ্ছিল। একটা ফাঁকা জানালা খুঁজে নিতে খুব একটা অসুবিধা হল না বিনির। টানা বারান্দার একেবারে একটেরেতে জানালাটা। ওদিকে ছাত্রীদের ভিড়টা অনেক কম। প্রায় কোন ছাত্রীই নেই বলা যেতে পারে। আসলে ওই জায়গাটা সবাই একটু এড়িয়েই চলে। জায়গাটার সম্বন্ধে অনেকের অনেকরকম বিশ্বাস। কেউ বলে ওখানে নাকি ভূতেরা থাকে, কেউ বলে ওখানে গুপ্তধন আছে, আবার কেউ বলে ওখানে নাকি কিছুই নেই। কিন্তু যে যাই বলুক ওই কোণটাতে বিশেষ কেউ সাহস করে যায় না। বিনিরা যখন আরও ছোট ছিল, তখন একবার গুজব ছড়ালো, একজন টুয়েলভের দিদিকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলল ওরা নাকি ওই দিদিটাকে দেখেছে ওই কোণে যেতে তারপর ওইখানে যে দরজাটা আছে সেটা খুলে ঢুকতে, কিন্তু তাকে আবার কেউ নাকি বেরিয়ে আসতে দেখেনি। দিদিটাকে আর কোনদিন স্কুলে দেখাই যায়নি। তারপর থেকে তো জায়গাটার আরও বদনাম হয়ে গেল।

আজ বিনির মন খারাপ। ওর মাথায় কিছুই ঢুকল না। কোন চিন্তাভাবনা না করেই ওই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এদিক দিয়ে স্কুলের পেছনে যে ফাঁকা মাঠ সেটাকে বেশ ভালো করে দেখা যায়। মাঠটাতে সূর্যের খাড়া রোদ্দুর এসে পড়ছে। গরমে সমস্ত ঘাস শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। একটা লোকও নেই। বিনি জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা । ওর ফাঁকা মাঠ দেখতে একটুও ভালো লাগছিল না। সেখানে তো দেখার কিছুই নেই। খালি শুকনো হলুদ ঘাস - আর কিছু না। বিনি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল বোধহয়। চোখ খুললেই তো সেই একই জিনিস দেখতে হবে। কিন্তু চোখ খুলতেই সে যা দেখল, তা সে ভাবতেই পারেনি। জানালার বাইরে কোথায় ফাঁকা মাঠ, কোথায় হলুদ, মড়া ঘাস ! সব ভ্যানিশ!

একেবারে উধাও। তার বদলে জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছে নীল সমুদ্র, হলদে সমুদ্র-সৈকত, দূরে দেখা যাচ্ছিল পাম গাছ।

বিনি আঁতকে উঠল। এ কী? জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। নাঃ কোন সমুদ্র-টমুদ্র নেই, সেই একঘেয়ে স্কুল আর দূরে কিছু ইউনিফর্ম পড়া মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করছে। আবার জানালার দিকে তাকাল বিনি, কিন্তু দ্বিতীয় বারও ও দেখল নীল সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, আর পাম গাছের সারি। এবার রীতিমত ভয়ই পেয়ে গেল বিনি। তাড়াতাড়ি সবচেয়ে কাছের যে অন্য জানালা রয়েছে তার কাছে চলে গেল দেখতে। কিন্তু এ কী? এই জানালাটার বাইরে তো সমুদ্র-সৈকত নেই, পাম গাছও নেই। রয়েছে শুধু ফাঁকা মাঠ আর হলুদ ঘাস। বিনি আবার ওর নিজের জানালার দিকে হাঁটা লাগাল। মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আমি কী দেখছি? আমি কি পাগলই হয়ে গেলাম?'

এইবার বিনি আশা করেছিল যে জানালার বাইরে ও আবার হলুদ ঘাসে ভরা মাঠই দেখবে। ঠিক আশা করেনি, চেয়েছিল। কিন্তু এবারও জানালার বাইরে সেই একই দৃশ্য। নীল সমুদ্র, হলদে সমুদ্র সৈকত, আর দূরে পাম গাছের সারি। এবার কিন্তু বিনির ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ লাগল না। দৃশ্যটা তো খুবই সুন্দর। ও দেখতে লাগল, চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল। সত্যি! কি সুন্দর সমুদ্রটা। কি নীল। বেশ মুগ্ধ হয়ে গেল বিনি।

চমক ভাঙল বেলের শব্দে। টিফিনের বেল পড়ল তবে। বিনির কিন্তু এই তার নিজস্ব সমুদ্রটাকে ছেড়ে চলে যেতে একদমই ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু যেতে তো হলই। ক্লাস শুরু হয়ে যাবে যে। বাকি সারাদিন বেশ অন্যমনস্ক হয়ে থাকল বিনি। সব সময় চোখের সামনে ভাসছিল সেই নীল সমুদ্র, হলদে সমুদ্র সৈকত আর দূরে পাম গাছের সারি।

পরদিন টিফিনের সময় ব্যাপারটাকে পুরোপুরি আজগুবি মনে হল। কী করে হতে পারে? সেই জানালাটার কাছাকাছি আসতে আসতে তো একেবারেই ধরে নিয়েছিল বিনি যে আজ আর দেখা যাবে না সেই অদ্ভুত দৃশ্য। আজ আবার অন্যদিনের মতন দেখা যাবে ফাঁকা মাঠ আর হলুদ ঘাস। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বিনি জানালাটার দিকে। আজকে কী দেখবে তার চিন্তায় ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। জানলাটার সামনে এসে দাঁড়াল বিনি। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল ও উত্তেজনায়। চোখ খুলতেই দেখে, না, আজকে আর সমুদ্র নেই, কিন্তু তার বদলে আজ রয়েছে পাহাড়।

জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিল দূরে বরফের টুপি পরা সারি সারি পাহাড়, তার সামনে সারি সারি পাইন গাছ। ঝকঝকে নীল আকাশ, তাতে পেঁজা তুলোর মতন ভাসছে মেঘের দল। গতকালের সমুদ্রের চাইতেও এটা বেশি ভালো লাগছিল বিনির। জানালার ধারেই বসে পড়ল সে, হাতে টিফিন বাকসো যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল, বিনি চেয়ে রইল বাইরের দিকে, মন্ত্রমুগ্ধ চোখে। মনটা কেমন যেন খুশি খুশি লাগছিল ওর। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। জানালাটা

এমন কিছু দেখায় যা অন্য জানালা দিয়ে দেখা যায় না, আর এই ব্যাপারটা জানে শুধু সে, আর কেউ নয়।

বন্ধুদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছিল অবশ্য তারই কয়েকদিন পরই। তবুও টিফিন টাইমে বিনিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে গেল। বিনি যেতে চায় না। বলে, 'তোরা যা আমি জানালার ধারে বসে খেয়ে নেব।' বন্ধুরা বুঝে উঠতে পারে না যে জানালার ধারে ও এমন কী পেল যে ও তাদের সাথে টিফিনও খাবে না? কিন্তু সে কথা তো জানে খালি বিনি, আর কেউ নয়। বিনি কাউকে বলেওনি এ ব্যাপারে। বলে কী লাভ? কেউ কি বিশ্বাস করবে ওর গল্প? ওর জাদু জানালা ওর মনের মধ্যেই সযত্নে রাখা রইল, কিন্তু তা আর কেউ জানতে পারল না।

তারপর কেটে গেছে কত বছর। কত গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শীত-বসন্ত কেটে গেছে তারপর। বিনির মেয়ে টিনা যায় এখন স্কুলে। তবে যে সে স্কুলে নয়, বিনিরই ছোটবেলার স্কুলে, ক্লাস ওয়ানে। তারপর একদিন টিনা মুখ কালো করে বাড়ি ফিরল। বিনি জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? মন খারাপ মনে হচ্ছে?'

টিনা উত্তরে বলল, 'আজকে আমার সব বন্ধুরা আমার সাথে আড়ি করে দিয়েছে। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। '

বিনি আলতো করে হেসে জবাব দিল, 'আচ্ছা টিনা, তুই এক কাজ করিস। দো'তলার বারান্দার একদম শেষে যে জানালাটা আছে সেখানে একবার যাস। দেখবি ভাল লাগবে।'

টিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা, কী আছে ওখানে?'

টিনা রহস্যময়ভাবে হেসে বলল, 'দেখিস!

<u>সমাপ্ত</u>